মানববিদ্যা গবেষণাপত্র পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৯ ॥ জুলাই ২০২২ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

সুর সাধক আব্দুল গফুর হালীর জীবন ও সৃষ্টি

ওরিন নাশিদ হৃদি*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: যে কোন জাতিসত্তার আত্ম-পরিচয়ের সূত্র ঐ জাতির লোকসংস্কৃতি তথা লোকসংগীত বা লোকসাহিত্যে নিহিত থাকে। কিন্তু আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির প্রবল অভিঘাতে আবহমান বাংলার লোকসংগীত ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল ধারা ক্রমশ ম্রিয়মাণ। তাই যেন সমকালীন সাংস্কৃতিক সংকটে বিভ্রান্ত আজ বাঙালি-মানস। শেকড়চ্যুত বাঙালি-চৈতন্যে লোক-ঐতিহ্য ও লোক সংগীত ও সংস্কৃতির শক্তি সঞ্চার করার মাধ্যমেই জাতীয় সংকট নিরসন সম্ভব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা ও আঞ্চলিক গান লোকসংস্কৃতি ও সংগীতের সর্বপ্রথম ও খাঁটি উপাত্ত যা লোককবির শেকড় অনুসন্ধানে সহায়ক হতে পারে। যুগধর্ম ও তার প্রভাবকে মেনে নিয়েই এ ধারায় আবদুল গফুর হালী তাঁর লোকসংগীত রচনায় আঞ্চলিক ও মাইজভাণ্ডারি গানসহ আরো বিভিন্ন ধারায় বিচরণে কী ধরনের বিষয় বেছে নিয়েছিলেন এবং তার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি তার জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে।

মরমী ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে বাংলা লোকগানের হাজার বছরের যে ইতিহাস সেই লোকসঙ্গীতের অন্যতম অংশ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান ও মাইজভাণ্ডারী গানের সাধকশিল্পী আবদুল গফুর হালী (১৯২৮-২০১৬)। বারো আউলিয়ার দেশে যিনি অল্প বয়সেই ভাব-সুরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং পরবর্তী আশি পেরিয়েও আমৃত্যু সুরের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ছিলেন সেই মহান লোক কবি, শিল্পী, নাট্য রচয়িতা আবদুল গফুর হালী গানে-গানে সুরে-সুরে সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না রূপায়িত করেছেন। তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে এসে আধ্যাত্মিক চেতনার নতুন রূপ মানুষের হৃদয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন মাইজভাণ্ডারি গান রচনার মাধ্যমে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষায় সাধারণ মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ-কান্নাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং চাটগাঁইয়া ভাষাকে সমগ্র বিশ্ব-মণ্ডলের মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন।

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

জিলা চট্টগ্রাম রে বারউলিয়ার স্থান
এই জিলাতে জন্ম কত আউলিয়া মাস্তান রে।
শাহ বদর জ্বালাই বাতি
ধাইয়া গেল দানব জাতি
চাটি দিয়া আবাদ করে
চাটগাঁ হল নাম রে॥
(সম্পা. হায়দার ২০১৩: ১৫১)

তাঁর সুরের আকুলতা কণ্ঠস্থ করে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা হয়েছে একেকজন কিংবদন্তী। জীবনের সবটুকু বিলিয়ে দিয়েও আর্থিকভাবে সদা অস্বচ্ছল থাকতে হয়েছে। তাঁর সহধর্মিণী প্রতি তাঁর সহমর্মিতাও একজন গবেষক হিসেবে আমার হৃদয়কে সিক্ত করে। একজন শিল্পী তাঁর জীবনকেও যখন সংগীতের মতই সাবলীল করে তুলতে জানেন সেই মহান আত্মা পরিণত হয় পরমাত্মায়।

কিংবদন্তীতুল্য এই লোকসাধক জন্মগ্রহণ করেন ৬ আগস্ট ১৯২৮ মতান্তরে ১৯২৯ সালের ১৩ আগস্ট (আরেফিন ২০২০: ৭৪)। গফুর হালীর মায়ের ভাষ্যমতে ১৯২৮ সালেই জন্ম তাঁর (সম্পা. চৌধুরী ২০১৪: ভূমিকাংশ)। তিনি ছিলেন একাধারে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান ও মাইজভাণ্ডারী গানের রচয়িতা, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী এবং নাট্যকার। তার জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার শোভনদণ্ডী ইউনিয়নের রশিদাবাদ গ্রামে। বাবার নাম আব্দুস সোবাহান ও মায়ের নাম গুলতাজ খাতুন। লেখাপড়া করেছেন রশিদাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জোয়ার বিশ্বম্বর চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ে, এ স্কুলেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। আর্থিক দীনতার কারণে এক বছরের বেতন চব্বিশ টাকা দিতে না পারায় পড়াশুনা আর এগোয়নি আব্দুল গফুর হালীর। এরপর তিনি লেখালিখিতে মনোনিবেশ করেন। (আরেফিন ২০২০: ৭৪)

সংগীতে তাঁর প্রতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই বললেই চলে। গফুরের ভাষায় তিনি হলেন "গাইতে গাইতে গায়েন"। পটিয়ার রশিদাবাদের শোভনদন্ডী গ্রামে সাধকশিল্পী আস্কর আলী পণ্ডিত (১৮৪৬-১৯২৭) এর জন্ম*। আস্কর আলীই ছিলেন শিল্পী গফুর হালীর মূল প্রেরণা শক্তি। তাঁর গান শুনে বড় হয়েছেন গফুর। ছোটবেলায় আস্কর আলীর আধ্যাত্মিক মরমী গান গফুরের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। গ্রামে লেটোর দল, যাত্রাদলের আনাগোনা ছিল নিয়মিত। হতো পালাগান, গাজীরগান। পুঁথি পাঠের আসর বসতো ঘরে ঘরে। এসব আসরের নিয়মিত শ্রোতা ছিল শিশু গফুর। (সম্পা. হায়দার ২০১৩: ১৮)

হলে যেয়ে সিনেমা দেখতে পছন্দ করতেন ছোট্ট গফুর। ছায়াছবির গানগুলো হুবহু গাইতে পারতেন। একদিন তাঁকে যাত্রা অনুষ্ঠানের মঞ্চে তুলে দেন স্থানীয়রা। গান শুনে সবাই প্রশংসা করলেন। তবে গফুরের বাবা এসব পছন্দ করতেন না। গান না করার জন্য অনেক শাসন করেছেন। (সম্পা. চৌধুরী ২০১৪: ভূমিকাংশ)।

গফুরের ভাষায়,

> আমার পারিবারিক অবস্থা তেমন ভালো ছিলো না। সুতরাং দুর্ভিক্ষের কারণে এবং পারিবারিক অবস্থার কারণে আমাকে লেখাপড়া করানো বন্ধ করতে হয়েছে। বন্ধ করার পরে কি করব? গানের প্রতি আমার একটা আগ্রহ ছিল। 'গান গান গান' যেখানেই গান হতো ঐখানেই চলে যেতাম আমি। (চৌধুরী ২০১০: *মেঠোপথের গান)*

তবে গফুরের বাবা গানের এসব প্রশংসা অপছন্দ করতেন। গান না করার জন্য ছেলেকে অনেক শাসন করেছেন। বাবা ভাবলেন ছেলেকে বিয়ে করালে সাংসারিক হবে, তাই গফুরকে বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনলেন। তখন গফুরের বয়স মাত্র ২২-২৩। কিন্তু হলো উল্টোটা। গফুর বলেন—

আমি আমারে বেইচা দিছি
মাইজভাণ্ডারে যাই রে
আমার কিছু নাই
ওরে আমার কিছু নাই রে
আমার কিছু নাই॥
গিয়েছিলাম প্রেম-বাজার
প্রেম-রতন কিনিবারে
কিনিতে যাইয়া আসিয়াছি
নিজেরে বিকাই রে ॥
(সম্পা. হায়দার ২০১৩: ৮)

বিয়ের পর বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসারী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন গফুর। মোটামুটি আয় রোজগার করতেন। বাবার পুরনো ব্যবসায় মন দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। ১৯৫৫ বা ৫৬ সালের দিকে একদিন হঠাৎ হাজির হলেন ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার দরবারে। এখানেও গানের প্রেমে পড়লেন। রমেশ শীল, বজলুল করিম, মন্দাকীনি, মৌলানা হাদীর লেখা মাইজভাণ্ডারীর গান তাঁর শিল্পী মনকে প্রভাবিত করে। লাল পোশাক পরা লোকজন যখন মাইজভাণ্ডারে ঢোল বাজিয়ে নেচে নেচে গাইতেন তখন গফুর হালীও তাঁদের সঙ্গে নাচতেন, গলা মেলাতেন। একদিন মাইজভাণ্ডারে ভক্তদের অনুরোধে গাইতে হলো আবদুল গফুরকে। শ্রোতারা গান শুনে মুগ্ধ হয়ে অনেক টাকা দিলেন। গান গেয়ে টাকা পাওয়া যায় এ অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে একবারে নতুন। তিনি টাকাগুলো মাইজভাণ্ডার শরীফে দিয়ে দিলেন।

গফুর হালী বলেন—

> মনে হলো আমি যেন আমাকে হারিয়ে ফেললাম মাইজভাণ্ডারির প্রেমবাজারে। অনেকটা পাগলের বেশে গ্রামে ফিরলাম। একটা শব্দই শুধুই শুনি আকাশে বাতাসে কে যেন আমায় বলছে, 'লেখ লেখ'। অবশেষে লিখতে বসলাম, গান বাঁধলাম। (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)

আর কত খেলবি খেলা মরণ কি তোর হবে না
আইল কত গেল কত কোথায় তাদের ঠিকানা ॥
(সম্পা. মহসিন ২০১৭: ২১)

পুরোদমে গান লেখা ও সুর করা শুরু হলো আবদুল গফুরের। তখন মাইজভাণ্ডারেই দিন কাটে গফুরের। এ সময় মাইজভাণ্ডারের পীর হযরত সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারী (র.)-র হাতে বাইয়াত হন তিনি। পীর সাহেব একদিন তাকে "হালী" পদবী দেন। সেই থেকে আবদুল গফুর হয়ে গেলেন আবদুল গফুর হালী (সম্পা. হায়দার ২০১৫: ৪২-৪৩)।

সংগীত জীবনে দাদীর অবদান

ছোটবেলার একটা ঘটনা গফুরকে প্রায়ই নাড়া দিতো। চল্লিশ পঞ্চাশের দশকের দিকে মানুষ দিন বদলের আশায় দুবাই, আমেরিকা, লন্ডন যান। ভিনদেশে আয় রোজগারের জন্য চট্টগ্রামবাসীর প্রথম পছন্দ বার্মা মুলুক অর্থাৎ বর্তমান মিয়ানমার। অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তার দাদী। গফুর হালীর দাদা সলিম উদ্দিনও নাফ নদী পাড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন মিয়ানমারে। সেই সুন্দরী বউকে বাড়িতে রেখে বার্মা যাওয়ার পর কয়েক বছর দাদার কোন খবর পাওয়া যায় না। পাঁচ সাত বছর পরে একদিন শুনলেন "রেঙ্গুন রঙ্গিলার সনে" তার মন মজেছে। অর্থাৎ মিয়ানমারে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করেছেন সলিম সাহেব। আর এদিকে স্বামীর অপেক্ষায় দিন গেলো সলিমের স্ত্রী গফুর হালীর দাদির। স্বামীকে আর কখনোই ফিরে পান নি বিরহী এই নারী। পরিণত বয়সে দাদীর সেই দুঃখ গাঁথা নিয়ে গান বাঁধেন গফুর হালী—

অ শ্যাম রেঙ্গুম ন যাইয় রে
হনে খাইব রেঙ্গুমর কামাই রে শ্যাম
রেঙ্গুন ন যাইয় রে ॥
(সম্পা. চৌধুরী ২০১৪: ৫)

সত্তরের দশকে গ্রামোফোন রেকর্ডে শেফালী ঘোষের গাওয়া দাদীর সেই দুঃখগাঁথা গানটি ঝড় তুলেছিল গোটা চট্টগ্রামে, এই গান এখনো কাঁদায় বিরহী নারীকে। এই গানে উন্মাতাল হন সব বয়সের মানুষ (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ৪৩)।

পরে এ গানটির কথা কিছুটা পরিবর্তন করে আবদুল গফুর হালীর আঞ্চলিক নাটক "গুলবাহার"-এ ব্যবহৃত হয়েছে:

ও সাম বৈদেশ ন যাইয় রে
হনে খাইব বৈদেশর কামাই রে॥
(সম্পা. চৌধুরী ২০১৪: ৮৪)

আবদুল গফুর হালীর বেতারজীবনঃ

তখন শিল্পী হিসেবে মোটামুটি নাম হয়েছে আবদুল গফুর হালীর। একদিন বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রে অডিশনের ঘোষণা শুনে তিনি ভবনে হাজির হলেন। অডিশনে গাইলেন,

আর কতদিন খেলবি খেলা
মরণ কি তোর হবেনা...॥
(সম্পা. মহসিন ২০১৭: ২১)

বেতারে তখন অডিশনের গান সরাসরি প্রচার হতো। গফুর হালী গ্রামে পৌঁছার আগেই গান প্রচার হয়ে গেল। বেতারে গফুর হালীর গান শুনে রৌশনহাট রেল স্টেশনে গ্রামের শত শত মানুষ তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিলো। ট্রেন থেকে নামার পর তাঁকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে যায় জনতা। পরে হালী শুনেছিলেন বেতারের অডিশনে তিনি প্রথম হয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সাল থেকে বেতারে গফুরের লেখা গান প্রচার শুরু হলেও প্রথম সাত আট বছর তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। গান প্রচার হতো সংগ্রহ হিসেবে। কারণ গীতিকার ও সুরকার হিসেবে তখনো তালিকাভুক্ত হননি গফুর হালী। ১৯৭২ সালে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর শ্রোতারা অবাক হয়ে শুনলেন, বেতারের অনেক জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা আবদুল গফুর হালী। সেই থেকে বেতারই তাঁর ঘরবসতি। 'ক' বিশেষ শ্রেণির শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার (সম্পা. হায়দার ২০১৫: ৪৫)।

আশির দশকে অডিও ক্যাসেট যুগ শুরু হলে চট্টগ্রামের নিউমার্কেটে ঐকতান, রিয়াজউদ্দিন বাজারে বিনিময় স্টোর, জাহেদ ইলেকট্রনিক্স, আমিন স্টোরসহ কয়েকটি অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে যায়। গ্রামোফোন রেকর্ডের থেকে ক্যাসেটে গানের সংখ্যা বেশি প্রয়োজন হয় আর বাজারে ক্যাসেটের চাহিদা বেশি থাকায় সংগীত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গফুর হালীর কদর বাড়ে। দিনে দিনে খ্যাতিমান হয়ে উঠেন গীতিকার সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক আব্দুর গফুর হালী (সম্পা. হায়দার ২০১৩: ১৯)।

প্রসঙ্গত, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ঐকতান থেকে প্রকাশিত অডিও অ্যালবামে প্রকাশ্যে এসেছে আব্দুল গফুর হালীর নাম। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন শিল্পীরানী। আমিন স্টোরের মালিক হাজী মাহমুদুল হক, তার ছেলে মোহাম্মদ নুরুল আমিন, সংগীত বিভাগের প্রধান নুরুল হক, ন্যাশনালের সেলিম বিনিময়ের আবদুল্লাহ সহ অনেকের সাথে গফুর হালীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর সুবাদে শেফালী ঘোষ, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, সনজিত আচার্য, কল্যাণী ঘোষ, সিরাজুল ইসলাম আজাদ, আহমদ নুর আমির, আব্দুল মান্নান, সেলিম নিজামী, শিমুল শীলসহ জনপ্রিয় শিল্পীদের অ্যালবাম তৈরিতে বিশেষ শ্রম দিয়েছিলেন গফুর হালী। আর তখন চট্টগ্রামের সংঙ্গীতাঙ্গনে ছিলো অনেক সুপারহিট ক্যাসেট আর অনেক জনপ্রিয় গান। তবে গফুর হালীর জীবনের শেষ বছরগুলোতে রিয়াজউদ্দিন বাজার কেন্দ্রিক অডিও শিল্পের দুর্দশা চলছিলো (সম্পা. হায়দার ২০১৫: ৫০)।

আব্দুল গফুর হালীর অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ

গফুর হালীর আঞ্চলিক গানে বহুল জনপ্রিয় শিল্পী শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব। শ্যাম গানের মানুষ। কিন্তু নিউমার্কেটেও তার একটা ছোট খাটো দোকান ছিল। সে সূত্রে তাঁর

দোকানে শিল্পীদের আড্ডা বসতো সকাল-সন্ধ্যা। আড্ডায় একদিন ঢুঁ মারেন গানের জগতে তখন নবীন, আবদুল গফুরও। শ্যাম দিলখোলা মানুষ, আর গফুরও তেমনি। দুজনের ভাব হতে সময় লাগলো না তাই। নিজের গান নিয়ে শ্যামের কণ্ঠে তা তুলে দেন। বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রে "সংগৃহীত" গান হিসেবে প্রচারিত হয় এগুলো। বেতারে তালিকাভুক্ত হননি বলে গীতিকার হিসেবে গফুরের নাম যেত না।

গানগুলোর জনপ্রিয়তা দেখে বেতারে একদিন ধরলেন শেফালী ঘোষ। বললেন "উ দা শ্যামরে দিলে অইতো ন, আঁরেও গান দেওন ফরিব" (শুধু শ্যামকে দিলে হবে না, আমাকে গান দিতে হবে) শেফালী বার বার তাগাদা দেন আর গফুর ভুলে যান। একদিন আঞ্চলিক পরিচালক (আরডি) আশরাফুজ্জামানকে নালিশ দেন শেফালী, "গফুরদা আমাকে গান দিচ্ছেন না" আরডি গফুর হালীকে ডেকে পাশে বসিয়ে চা খাওয়ান এবং শেফালীকে গান দিতে অনুরোধ করেন। গফুর আরডিকে বলেন, "একটা দ্বৈত গান আছে। সেটা শ্যাম ও শেফালীকে দিয়ে গাওয়ানো যায়"। গফুরের প্রস্তাব লুফে নেন আরডি। বলেন আপনি কালই গান রেকর্ড করে দেন। দুদিন পর শ্যামসুন্দরের চকবাজারের বাসায় এসে শ্যামকে নিয়ে নন্দনকাননে শেফালীর বাসায় যান। শ্যাম ও শেফালীর কণ্ঠে তুলে দেন এই গানটি—

ন যাইও ন যাইও
আঁরে ফেলাই বাপের বাড়িত ন যাইও (ছেলে)
ই গইরজ্য ন গইরজ্য
বাপের বাড়িত যাইতাম মানা ন গইরজ্য (মেয়ে) ॥
(সম্পা. চৌধুরী ২০১৪: ১৮৬)

গানটি বেতারে প্রচারের পর বেশ আলোড়িত হয়। শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব ও শেফালী ঘোষের নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এর আগে অবশ্য মলয় ঘোষ দস্তিদারের, "নাইয়র গেলে আইস্য তাড়াতাড়ি'' দু' একটা দ্বৈত আঞ্চলিক গান গেয়েছিলেন শ্যাম-শেফালী। কিন্তু এই "নাইয়র" গানটির দারুণ জনপ্রিয়তা আঞ্চলিক গানে নতুন ধারা সৃষ্টি করল; যেন প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন জুটি— "শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব ও শেফালী ঘোষ।"

এই একটি গান গফুরের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দিল। সংগীত জীবন শুরু হয়েছিলো শিল্পী হিসেবে, খ্যাতিমান হলেন গীতিকার ও সুরকার হিসেবে। সেই ১৯৬৪ সাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গানের সাথেই ছিলেন আবদুল গফুর হালী। শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব ও শেফালী ঘোষের অসংখ্য জনপ্রিয় আঞ্চলিক গানের স্রষ্টা তিনি। তাঁর গান গেয়ে নাম কুড়িয়েছেন জাতীয় ও স্থানীয় অনেক শিল্পী। তাঁর মাইজভাণ্ডারী গান চট্টগ্রামের লোকসংগীতের বটবৃক্ষ স্বরূপ। (সম্পা. হায়দার ২০১৩: ২১)

চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণে ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত শামসুল আরেফীনের "লোকগানের অবিনাশী কণ্ঠ কর্ণফুলি কন্যা শেফালী ঘোষ" প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে গফুর

হালী ২০০৮ সালের ২৪ অক্টোবর পাঠ প্রতিক্রিয়ায় তিনি লিখেন,

> ১৯৬৩ সাল থেকে শেফালীকে গান শেখাতে শুরু করি। ... সুদীর্ঘ সময়ে শেফালী আমার রচিত ও সুরারোপিত গান গেয়েছে সবচেয়ে বেশি। যা এখনো বাংলাদেশের অডিও, ক্যাসেট, সিডি ও ভিসিডি আকারে দেশ-বিদেশে সঙ্গীতানুরাগীদের বিমোহিত করে আসছে। শেফালী ঘোষের গাওয়া আমার রচিত গানের একক অ্যালবামের সংখ্যা প্রায় ২৫টি। এছাড়াও শ্যাম-শেফালীর দ্বৈত অ্যালবাম আছে দুটি। এছাড়াও লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডিস্ক (DISC) রেকর্ডে ৬টি গানের মধ্যে ৪টি গানই আমার রচিত ও সুরারোপিত। (আরেফিন ২০২০: ৭৫)

> বস্তুত শেফালী ঘোষ গফুর হালীর সর্বাধিক গান গাওয়ার কারণে একথা স্পষ্ট হয় যে, কণ্ঠের মাধ্যমে তাঁর গান দীর্ঘ সময় ধরে প্রচার প্রকাশ প্রসারে শেফালী ঘোষের ভূমিকা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্ববিধি ও জ্ঞান জ্যোতির মাধ্যমে ১৪০টি গান প্রকাশিত হয় গফুর হালীর। এই গানগুলোর মধ্যে অল্পসংখ্যক গান গীত হয়। (আরেফিন ২০২০: ৭৫)।

এরকম একটি গান—

পাখিরে তুই সুখের আশায়
বাসা বাঁধিস না
মিছে এই মায়া সুখ পাবি না॥
আসলে তুফান নিদান কালে
যাবি তখন কোন সে ডালে
পিছে কি হবেরে তোর কেন ভাবিস না॥
ওরে পাখি যারে উড়ে—
ডানা মেলে বহু দূরে—
এই মায়া নগরে ফান্দে পড়িস না॥
তোর ডিম্ব ছানা হবে যখন,
বাড়বে রে শত জ্বালাতন
কান্দিলে যাবে না তোর এই যন্ত্রণা॥
(সম্পা. হায়দার ২০১৩: ১৯৩)

গানটি প্রয়াত কণ্ঠশিল্পী সেলিম নিজামীর কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়।

২০০৪ সালে শিল্পী সন্দীপনের উত্থান আবদুল গফুর হালীর "সোনা বন্ধু" গানটির রিমিক্স গেয়ে। লন্ডনে বাস করা বোয়ালখালীর কন্যা শিরিনের উত্থানও গফুর হালীর স্মরণীয় সেই গান "পাঞ্জাবিওয়ালা" ও "মনের বাগানে" রিমিক্স গেয়ে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া বলেন, "শুধু গান নয় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রথম লোকনাটকের রচয়িতাও আবদুল গফুর হালী।" (সম্পা. হায়দার ২০১৫: ২৯)। তেমনিভাবে চলচ্চিত্রেও গফুর হালীর গান ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। চাঁটগাইয়া ভাষায় অদক্ষ, সাবিনা ইয়াসমিনের মতো শিল্পী কী অবলীলায় এম. এন. আখতারের সাথে দ্বৈতকণ্ঠের আঞ্চলিক গান "কইলজার ভিতর গাঁথি রাইখ্যুম তোঁয়ারে" গাইলেন এবং সুপারডুপার হিট হয়েছিলো। "মলহা বানু" চলচ্চিত্রে সাবিনা ইয়াসমিনের গান আজও হৃদয়ে গেঁথে আছে।

গফুর হালীর স্ত্রী

১৯৫৯ সালের ২৯ মে আবদুল গফুর হালী চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার পাইকপাড়ার মরহুম খলিলুর রহমানের তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ কন্যা রাবেয়া খাতুনকে বিয়ে করেন। গফুর হালীর পরিবার ছিলো সংগীত বিরাগী, তেমনি তাঁর স্ত্রীও সংগীত পছন্দ করতেন না। কিন্তু কালের পরিক্রমায় বুঝেন "স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতই হচ্ছে সুন্দর মাধ্যম।" এভাবে স্ত্রী রাবেয়াও সঙ্গীতপ্রেমী হয়ে উঠেন। (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)

একবার হালীকে প্রশ্ন করা হয়—"গান গেয়ে কি পেলেন?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উত্তেজনায় কণ্ঠ ধরে আসে গফুর হালীর। তিনি বলেন:

> পয়সা তো কম কামাইনি। সেসব কোথায় জানি না। সংসার কীভাবে চলেছে তাও আমি জানি না। জানে আমার স্ত্রী। তবে এটা জানি সংসারে কষ্ট ছিল। কী পেয়েছি কী পায়নি তা হিসাব করিনি। করবও না কখনো! (সম্পা. হায়দার ২০১৩: ২২)

নানা টানাপোড়েন ও অভাবের মধ্যেও স্ত্রীর কাছ থেকে অসম্ভব সমর্থন পেয়েছেন গফুর। শিল্পী দেশে-বিদেশে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন, কিন্তু সংসার আর সন্তানদের আগলে রাখার কাজটা করেছেন হালীর প্রিয়তমা স্ত্রী রাবেয়া বেগম। স্বামীর কাছে কখনো কোনো অভাব নিয়ে অভিযোগ করেননি।

২০০৩ সালের গ্রীষ্মের এক সকালে গফুর হালীর চাচা গিয়েছিলেন তার নন্দনকানন হরিশদত্ত লেইনের বাসায়। এনায়েত বাজার পুলিশ ফাঁড়ির সাথেই একটি কুঁড়ে ঘর, ইট কংক্রিট এর শিল্প ভবনে। আধুনিক নগর জীবন থেকে আলাদা ছিল গফুর-রাবেয়ার জীবনধারা। গফুর হালীর তখন বেতারের কাজের প্রয়োজনে শহরে থাকা খুবই প্রয়োজন ছিল। সে কারণেই বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন ২০০৩ সালের দিকে। গ্রাম থেকে মাঝেমধ্যে এসে বৃদ্ধ স্বামীকে সঙ্গ দিতেন রাবেয়া।

গফুর হালীর স্ত্রী ছিলেন আপ্যায়ন পরায়ণ। কেউ বাসায় গেলে সাধ্যমতো খাওয়াতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু সংসারে অভাব অনটন লেগে থাকায় অচিরেই শহরের বাসা ছেড়ে পটিয়ার রশিদাবাদে গ্রামের বাড়িতে ফেরত যেতে হয়। গ্রামে গেলেও গফুর হালীর সুরসাধনা থামেনি। নিয়মিত বিরতিতে লিখতেন গান, সুর করতেন ও সংগীত পরিচালনা করতেন।

শিল্পী স্বামীকে নিয়ে স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বলেন--

> আঁরার যেত্তে বিয়া অর হেত্তে আসিল দে বেকার। এন্ডে অন্ডে খাই গান গাইত, মাঝে মধ্যে হন্ডে যাইতগৈ। সংসারত অভাব আছিল। কিন্তু আঁই তেঁইরে হন অ দিন হন অ কিছু বুইঝত নঅ দি। (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)

গানের কারণে দিনের পর দিন গফুর হালী শহরে থাকতেন না। এ নিয়ে পাড়ার লোকেরা কুৎসা রটাতো। চট্টগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য কোনো নারী শিল্পীর সাথে জড়িয়ে কথা বলতেও পিছপা হয়নি তারা।

রাবেয়া খাতুন বলেন,

> আমি প্রথম প্রথম লোকের নিন্দা শুনতাম, মন খারাপ হতো। কিন্তু আমার স্বামীকে তো আমি চিনতাম। পরে যখন পাড়ার মেয়েরা এসব বলতো তখন আমিও তাদের ছেড়ে দিতাম না। (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)।

স্ত্রীর এই ভালোবাসা ও সহযোগিতার কারণে আবদুল গফুর হালী সঙ্গীত সাধনা করতে পেরেছেন নীরবে। গফুর হালীর প্রিয়তমা স্ত্রী রাবেয়া বেগম ৭৫ বছর বয়সে ২০১৪ সালের ১০ মার্চ ভোরে ইন্তেকাল করেন। জীবনসাথী হারিয়ে একা হয়ে যান গফুর। ৫৫ বছরের সংসার ছিলো তাদের। গফুর হালী তার জীবনব্যাপী স্ত্রীর প্রতি ও সঙ্গীত চর্চার প্রতি যে আকুণ্ঠ ভালোবাসা ছিল তা প্রকাশ করে গেছেন সবসময়।

তাইতো প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাটিকে উদ্দেশ করে গফুর হালী লেখেন—

ও মাটি
তোর কাছে আমানত দিলাম আমার বুকের ধন
রেখে দিস তুই আপন করে
করিয়া যতনের করিয়া যতন॥
কীট পোকারে করিস মানা কাছে যেন্ না আসে
তোর বুকে ঘুমায় বন্ধু আমি নাই তার পাশে
সাত রাজার ধন মানিক আমার
আমার বুকের ধন ॥
(সম্পা. চৌধুরী ২০১৪: ভূমিকাংশ)

গফুর হালী বলতেন—

> গান হচ্ছে আমার কাছে ইবাদত। আমি গানের মাধ্যমে স্রষ্টার তালাশ করি, তাঁকে পাবার সাধন করি। আমার ভালোবাসার মানুষ (স্ত্রী) আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, সবাই যাবে আমিও যাব—পরম প্রিয়তমের জন্য মোর মন কাঁদছে।
>
> (সম্পা. হায়দার ২০১৩: ২২)

তাইতো হালী গেয়ে ওঠেন—

নাইওরী নাইওর হল শেষ
এইবার চল নিজের দেশ
তোমার জীবন খাতায় লিখা আছে
সোয়ামির আদেশ
বাপের বাড়ি কয়েক দিনের
ছোট্টবেলার খেলা
অনন্তকাল স্বামীর বাড়ি
ইাই বেলা অবেলা বন্ধু...
এই মায়া নগর ছাড়িড়ে তুই হবি নিরুদ্দেশ॥
(সম্পা. হায়দার ২০১৩: ১৮৭)

মোহছেন আউলিয়ার জনক

আবদুল গফুর হালী মোহছেন আউলিয়া গানের প্রবর্তন করেন। আর এই গানের শিল্পী হিসেবে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেন শিমুল শীল। ১৯৯৪ সালে আব্দুল গফুর হালীর গীত রচনা ও পরিকল্পনায় শিমুল শীলের কণ্ঠে মোহছেন আউলিয়াকে নিয়ে অ্যালবাম করা হয়। নাম দেওয়া হয় "শাহ মোহছেন আউলিয়া।" আরেক কিংবদন্তী শিল্পী এম. এন. আখতারের গানও সেই অ্যালবামে ছিল। শিল্পী শিমুল শীল ছিলেন এনায়েত বাজার এলাকার আধ্যাত্মিক সাধক কাশেম বাবার ভক্ত। শিমুলের ইচ্ছা ছিল বাবাকে নিয়ে ক্যাসেট করবেন। শিমুল শীল ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক্সের মালিক সেলিমের কাছে আবদার করলেন রেকর্ড করবার জন্য। সেলিমই গফুরের কাছে তুলেছেন শিমুলকে। শিমুলের গানে মুগ্ধ হয়েই মোহছেন আউলিয়ার গান করান গফুর শিমুলকে দিয়ে। ওরশের আগে অ্যালবাম "শানে মোহছেন আউলিয়া" ক্যাসেট আকারে বের হলো আর সুপারডুপার হিট হলো। (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)।

এই গানটি মুখে মুখে ফিরতে লাগল—

চলরে জিয়ারতে আউলিয়ার দরবার
মোহছেন আউলিয়া বাবার বটতলী মাজার॥
(সম্পা. হায়দার ২০১৫: ৪৯)

এছাড়াও ''অলি বদর শাহ মোহছেন তারা মামা আর ভাগিনা'' ও ''আরব সাগর পাড়ি দিল পাথর ভাসাইয়া'' এবং শিমুল শীলের রচিত ও সংগৃহীত ''মোহছেন আউলিয়া বাবা কোথায় লুকাইলো'' গানগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল। শিমুল শীলের কণ্ঠে মোহছেন আউলিয়ার গানের ১৮টি ক্যাসেট বের হয়।

কি ধন দিলা আল্লাহ তুমি আনোয়ারা থানাতে
বটতলী গ্রাম রওশন হলো সেই নূরের আলোতে ॥
(সম্পা. হায়দার ২০১৫: ৫০)

গফুর হালীর গুরু রমেশ শীল

রমেশ শীলের (১৮৭৭-১৯৬৭) মৃত্যুর পর মাইজভাণ্ডারী গান সাধনায় কিছুটা ভাটা পরে। কিন্তু গফুর হালী এ শূন্যতাকে পূর্ণতা দান করেন। তিনি মাইজভাণ্ডারী গানকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। মাইজভাণ্ডারী গানকে রক্ষা করেন। গুরুবাদী দর্শনের গান রচনা করেন—

মুর্শিদ আমার মাইজভাণ্ডারী
আর কি দাসের ভাবনা
ত্রিজগত ত্বরাণেওয়ালা আমার বাবা মাওলানা॥
ঐ রাঙ্গা চরণে মিলিলে আশ্রয়
পাপী তাপির আর কিসের ভয়
তার নাম জিকিরে রত হুরপরী হয় মাস্তানা॥
(সম্পা. মহসিন ২০১৭: ২৭৫)

গফুর হালীর প্রেরণাশক্তি: আস্কর আলী পণ্ডিত

আস্কর আলী পণ্ডিত (১৮৪৬-১৯২৭) ছিলেন গফুর হালীর জীবনে মূল প্রেরণাশক্তি। আস্কর আলী পণ্ডিতের "শুইলে ঘুমে ন ধরে, ঘরের মানুষ বাইরে রইলে" এবং রমেশ শীলের—"আধার ঘরত রাইত কাডাইয়ুম কারে লই, বন্ধু গিয়ে গই" গান দুটির সুর করেন আবদুল গফুর হালী। (আরেফিন ২০২০: ৯৯)

গফুরের চর্চায় লালন সংগীত

লালন সাঁই তাঁর একটি গানে বলেছেন ''মানুষ ছাড়া খ্যাপা রে তুই মূল হারাবি, মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।" পরমাত্মার সান্নিধ্য পেতে হলে মানুষকে স্রষ্টা প্রেমে বিভোর হয়ে আত্মানুসন্ধান করতে হয়। কারণ মানুষের মাঝেই পরমাত্মা বিরাজমান। গফুর হালী এই নিয়ে বলেন:

মানুষেরি সঙ্গ ধর
ভব সিন্ধু হইতে পার
প্রেমের মানুষ
আছে মাইজভাণ্ডার ॥
মানুষ হইতে চাও যদি
কর মানুষ ভজনা
আত্মা শুদ্ধি না হইলে
মিছা সকল সাধনা
মানুষ বরকজ লইয়া কর
মনের আয়না পরিষ্কার॥
(সম্পা. মহসিন ২০১৭: ২৮৫)

এছাড়া লালনের জাতভাবনার সাথে নিজের ভাবনার একাত্মতা ঘোষণা করেন:

আমি আমার আল্লাহ রসুল
আমি আমার জাতি
লালনের যে জাত ছিলো
সংসার করছি বলে
মিশে আছি তোদের দলে
আমার ভাবে আমি চলি
কার কি হয়রে ক্ষতি... ॥
(সম্পা. হায়দার ২০১৩: ২৯২)

সুফিবাদ ও গফুর হালী

বাংলাদেশের সুফি সংগীতের দীর্ঘদিনের চর্চা কখনও কখনও নানা সংকট ও হুমকির মুখে পতিত হয়েছে নানা কারণে। আব্দুল গফুর হালী এই ধরনের সংকট মোকাবেলায় অবদান রেখেছেন। সুফি সাধনার অংশ হিসেবে নিজ বাড়িতে আবদুল গফুর হালী নতুন শিল্পী ও সাধকদের প্রশিক্ষণ দান করতেন:

আর কত কান্দাবি আমারে ভাণ্ডারি ধনরে
আর কত কান্দাবি আমারে
তোর সনে পিরিত করি
লোকে বলে দুষ্ট নারী
বান্দব কেউ মোর ন্যাইরে সংসারে॥
যেই আগুনে আমি জ্বলি
লোহা হইত যাইত গলি
কে বুঝিবে বুঝাইতাম কারে॥
(সম্পা. মহসিন ২০১৭: ৭১)

সুফি সাধনার অভিষ্ট লক্ষ্য হলো আত্মাকে পরমাত্মার সাথে একীভূত করে প্রেমের মাধ্যমে একে অপরের মাঝে লীন হয়ে যাবার সাধনা। আর এই সাধনায় পরমাত্মার সাথে মিলনে কেউ পিছিয়ে থাকতে চায় না।

গফুর হালী বলেন:

আসেকি ভাই বল না আমায়
আমার নাম আছে কি মাইজ ভাণ্ডারি
গোলামীর খাতায় ॥
চরণ সেবা করিবারে ভাগ্যে ছিল না
হাতের কাছে মধুর সাগর পান করিলাম না।
বন্দীজীবন কাটাইলাম সংসার জেলখানায় ॥
গফুর হালী বসে আছে মনের আশা লই
নয়নের তীর মারিয়াছি শিকার যাইব কই।
বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়া
বসে আছি সেই আশায় ॥
(সম্পা. মহসিন ২০১৭: ৯৪)

সত্যিই সুফিবাদ প্রেমিকজনের মনে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের নিরন্তর আশাবাদকে জাগিয়ে রাখে। রমেশ শীলের পর আবদুল গফুর হালী মাইজভাণ্ডারী গানের স্রষ্টা।

তাঁর একটি বিখ্যাত মাইজভাণ্ডারী গান:

আগুন আগুন কইলে কি আর পোড়া যায়
অন্ধ চোখে আয়না দিলে
অন্ধ কি আর দেখতে পায় ॥
জনম ভরে পড়লাম নামাজ
রাখলাম রোজা দিলাম যাকাত
মক্কা গেলাম হজ্ব করিতে বেহেস্ত পাইবার আশায়॥
(সম্পা. মহসিন ২০১৭: ৯৭)

মাইজভাণ্ডারী গানের অন্যতম স্রষ্টা

মাইজভাণ্ডারীতে হালী প্রবেশ করেন ১৯৫৬ সালে। মাইজভাণ্ডারী সংগীতের ঢোলের বাদ্য আর তাল তাঁকে অস্থির এবং আকুল করতো। "আর কত খেলবি খেলা" এই

গানটি মাইজভাণ্ডারী ধারার কিংবদন্তি গান হিসেবে পরিচিত। আবদুল গফুর হালীর মাইজাভান্ডারী গান নিয়ে একটি প্রবন্ধে বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও গবেষক শামসুজ্জামান খান বলেন—

> এতো কিছুর মধ্যে আবদুল গফুর হালীর গানের ভুবনের সবচেয়ে গুরুত্ব ও তাৎপর্যের যে পরিচয় তিনি এবং তত্ত্বজ্ঞানীরা দিয়ে থাকেন, তা হলো তাঁর রচিত মাইজভাণ্ডারী গান। (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)

মাইজভাণ্ডারীর রচিয়তাদের মধ্যে রমেশ শীল ছিলেন অগ্রগণ্য। কিন্তু রমেশ শীলের তিরোধানের পর মাইজভাণ্ডারী গানের জগতে এক ধরনের শূন্যতা দেখা দেয়, গফুর হালী সেই শূন্যতা সৃষ্টি হতে দেননি।

তিনি মাইজভাণ্ডারী গান রচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন গুরুবাদী সাধনায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন। অন্যদিকে তেমনি মাইজভাণ্ডারী গানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

তত্ত্ববিধি গ্রন্থে আছে ৪০টি মাইজভাণ্ডারী গান। এর মধ্যে ২/৩টি গান মুরশিদের উপরে। ১৯৮৯ এ হালীর মাইজভাণ্ডারীর উপরে গানের সংকলন "জ্ঞানজ্যোতি" প্রকাশ পায়। গফুর হালী গানে বলেছেন—

মাইজ ভাণ্ডারীর চরণ তলে
নাহি ত্বরালি।
(সম্পা. মহসিন ২০১৭: ২০২)

গফুর হালীর মাইজভাণ্ডারী গানের মাঝে সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি গান হলো—

দেখে যারে মাইজভাণ্ডারে
হইতেছে নূরের খেলা
নূরী মাওলা বসাইলো প্রেমের মেলা ॥ (সম্পা. হায়দার ২০১৩: ১৩৬)

তার আরো কিছু মাইজভাণ্ডারী গানের মধ্যে অন্যতম কিছু গান হলো—

দুই কূলের সোলতান, (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)।

আর কতদিন খেলবি খেলা,
মরণ কি তোর হবে না ॥ (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ২১)।

নতুন ঘরে যাব আমার
এই ঘরে আর মন বসে না', (সম্পা. হায়দার, ২০১৩: ১৯০)।

বাতেনের ভেদ কি জানো মনা ভাই,
একের আগে সংখ্যা
কাগজে কলমে নাই ॥ (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ২৩৫)।

নাচ মন তালে তালে
মাওলার জিকিরে
মাওলার জিকিরে নাচো
খোদার জিকিওে ॥ (সম্পা. হায়দার ২০১৩: ১৭৫)।

তোরা ভালমন্দ যা খুশি বল,
পরওয়া আমি করি না
ভাণ্ডারি নামেতে আমি দিওয়ানা ॥ (সম্পা. হায়দার ২০১৩: ১৫৭)।

কোন সাধনে তারে পাওয়া যায়,
মনরে বল আমায়...
ও মন রে...
মসজিদ-গীর্জা-কালিবাড়ি
দেখলাম কত তালাশ করি ॥ (সম্পা. হায়দার ২০১৩: ১৩৩)।
ভাণ্ডারী ভাণ্ডারী ভাণ্ডারী
রহমান মাওলা বাবা ভাণ্ডারী ॥ (সম্পা. মহসিন ২০১৭: ১৪৪)।

প্রেমের গান ও গফুর হালী

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে সব ধর্মের মানুষেরই মিলনমেলা বসে। যেখানে অহিংসা ও মানবতার চর্চা হয়।

আধ্যত্মিক সাধনায় প্রেমের শুদ্ধতম বিকাশ যে কত তীব্র হতে পারে তা সাধন সংগীত রচয়িতাদের গানে বোঝা যায়। একটি গান গফুরের:

যার হৃদয়ে আছে গাঁথা গাউছে মাইজভাণ্ডার
পূল ছেরাতের নিদান কালে ভয় কিরে আর তার॥
মুর্শিদ আছে যার অন্তরে
শয়তানে কি করতে পারে
এই কূল ঐ কূল দুই কূলে আনন্দবাজার ॥
(মহসিন ২০১৭: ৩৩৮)

বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও লোকগবেষক শামসুজ্জামান খান গফুর হালীর প্রেমের গান নিয়ে বলেন:

> আঞ্চলিক গানের পাশাপাশি তাঁর প্রেমের গানগুলিও কম জনপ্রিয় নয়, বলা চলে প্রেমের গানে মেতে আবদুল গফুর হালী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই চট্টগ্রামের মতো একটি প্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থান করলেও তাঁর গান গৃহীত হয়েছিল চলচ্চিত্রে এবং জনপ্রিয়তার তুঙ্গে স্থান নিয়েছিল। (মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)

বিশিষ্ট গবেষক নাসির উদ্দিন হায়দার গফুর হালীর প্রেমের গান সম্পর্কে বলেন—

> আবদুল গফুর হালীর গান সবসময়, সবশ্রেণি ও সব বয়সী মানুষের মন জয় করার সবচেয়ে বড় কারণ হলো তার গানে প্রেমে রঞ্জিত কথা ও সুর। গফুর হালীর প্রায় সব গানেই আছে প্রেমের ছোঁয়া। (মহসিন ২০১৭: ১৩৪)

প্রেমের আগুনে পুড়ে খাক হয়েছেন গফুর। প্রেমের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে গফুর হালী বলেন—

প্রেম করিলে কাঁদিতে হয়
প্রেমেতে সুখ নাই রে
সুজন বন্ধু কোন দেশেতে পাই রে।
ভাবিয়া না পাই রে আমি জাত ঘুরি চাই
এই সংসারে সবই আছে মনের মানুষ নাই
প্রেম করিয়াছে যারা কহে গফুর হালী
জাত লোহা হইয়াছে খাঁটি প্রেমানলে জ্বলি
হেথা কেউ তো কারও দুখ বোঝে না
স্বার্থের দুনিয়ায় রে॥
(চৌধুরী ২০১৪: ভূমিকাংশ)

নাটক রচনায় গফুর হালী

১৯৭৫ সালের দিকে বিটিভি'র একজন কর্মকর্তার অনুরোধে আঞ্চলিক নাটক লেখা শুরু করেন গফুর হালী। রচনা করেন তাঁর প্রথম নাটক *গুলবাহার* (১৯৭৫-১৯৭৬)। বিটিভিতে তখন এই নাটকটি প্রচারিত হয়নি, যা পরবর্তীতে মঞ্চায়ন হয় ২৬, ২৭, ২৮ অক্টোবর ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। নাটক নিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, *গুলবাহার* নাটক নিয়ে তিনি একবার কক্সবাজার গিয়েছিলেন। প্রথম শো-তেই নাটকটি ভীষণ সমাদৃত হয়েছিলো। অভিনয়ে ছিলেন অঞ্জু ঘোষ, পংকজ বৈদ্য, সুজনসহ চট্টগ্রামের নাট্য শিল্পীবৃন্দ। নাটকের একটি দৃশ্যে অঞ্জু ঘোষ যে কলা গাছ ধরে কেঁদেছিলেন, পরবর্তীতে নিলামে সে কলা গাছের দাম উঠেছিল ১০০ টাকা। নাটকটিতে আস্কর আলী পণ্ডিতের দুটি গানও ব্যবহার করা হয়। (হায়দার ২০১৩: ২২)

গুলবাহার নাটকের একটি গান তুমুল জনপ্রিয় হয়—

মনের বাগানে ফুটিল ফুল রে
রসিক ভ্রমর আইল না
ফুলের মধু খাইল না
দিঘির পানিতে ভাসিয়া ভাসিয়া
হাঁসাহাঁসি করে কেলিরে।
নারীর যৌবন জোয়ারের পানিরে
চিরদিন ত রইবে না॥
(হায়দার ২০১৫: ৭৪)

তাঁর লেখা জনপ্রিয় নাটকগুলোর মাঝে *কুশল্যা পাহাড়*, *নীলমনি*, *সতী মায়মুনা*, *চাটগাঁইয়া সুন্দরী* এবং *আশেক বন্ধু* অন্যতম।

স্বাধিকার আন্দোলনে আবদুল গফুর হালী

আবদুল গফুর হালী জীবনের ছয় দশকের বেশি কাটিয়েছেন সংগীতের সাথে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গান লিখে ও গেয়ে হয়ে উঠেছেন আঞ্চলিক গানের কিংবদন্তীতুল্য শিল্পী। রচনা করেছেন দুই হাজারের বেশী গান।

আবদুল গফুর হালী শুধু একজন শিল্পীই নন, তিনি চট্টগ্রামের লোকসংস্কৃতির বটবৃক্ষ। প্রতিটি গণসংগীত শিল্পীর মতো তাঁকেও পাশে পাওয়া যায় স্বাধিকার আন্দোলনে কণ্ঠসৈনিক হিসেবে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় গান রচনা করেছিলেন আবদুল গফুর হালী। ভাষা আন্দোলন নিয়ে তাঁর রচিত প্রথম গান—

বাংলাদেশত বাংলা ভাষা
হিন্দি হিন্দুস্থানত
আরব দেশেতে আরবি ভাষা
চীনা চীনত॥
(রিটন, এস এ টিভি, ডিসেম্বর ২০১৪)

'৬৯ এর উত্তাল আন্দোলনের সময় লালদিঘির ময়দানে বঙ্গবন্ধুর সামনে গফুর হালী একটি জাগরণমূলক গান গেয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ধাবিত হবার প্রেরণা যুগিয়েছেন। '৭০ এর ঐতিহাসিক নির্বাচন বঙ্গবন্ধুর নৌকা পাল তুলে ছুটছে কর্ণফুলি বিধৌত মানুষের হৃদয়ে।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গফুর হালী রচনা করেন—

নৌকা চলে নৌকা চলে
চলে হেলেদুলে
এই বাঙ্গালির নৌকা
এ নৌকা চালায় মুজিবর ॥
(রিটন, এস এ টিভি, ডিসেম্বর ২০১৪)

কোটি বাঙালির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৌকার হাওয়ায় ভাসলেন আবদুল গফুর হালীও। গান গেয়ে প্রচারণা চালান আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে। গফুর তখন একটি গান গাইতেন—

আল্লাহর দোহাই খোদার দোহাই
ফকা চৌধুরী কাদের দে উগ্‌গ ভোটর লাই॥
(হায়দার ২০১৫: ৪৬)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই গান শুনে গফুর হালীকে আশীর্বাদ করেন। (হায়দার ২০১৫: ৪৬)

আবদুল গফুর হালী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করেননি। তবে ক্যাম্পে গিয়ে গান গেয়ে উদ্দীপ্ত করতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁর একটি গান প্রচণ্ড উদ্দীপ্ত করতো মুক্তিযোদ্ধাদের।

ক্যাম্পে টিন বাজিয়ে, টেবিল চাপড়িয়ে গাইতেন—

তোঁর লয় আঁর নয় ন অইব অভাই,
আঁই বাঙালী, তুই পাঠান
তোর দেশে আর আঁর দেশে
দুই হাজার মাইল ব্যবধান ॥ (মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রৌশনহাটে ফকা চৌধুরী (ফজলুল কাদের চৌধুরী)-র শিষ্যরা আক্রমণ করেছিল আবদুল গফুর হালীর উপর। রাজাকাররা বলেছিল—

> তুমি তো নির্বাচনের সময় ('৭০-এর নির্বাচন) আমাদের নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে গান করেছো, এবার মজা বুঝবে। (হায়দার ২০১৫: ৪৬)

শিল্পী হিসেবে পাওয়া মানুষের ভালোবাসা স্বরূপ স্থানীয় লোকজন সেদিন গফুর হালীকে বাঁচাতে রাজাকারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নানা মঞ্চে ও মিছিলে তার মত চারণ শিল্পীর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। এই পর্যায়ে একবার পাকিস্তানি সেনাদের সম্মুখে পড়লে তিনি ভয়ংকর জোঁকের কামড় সহ্য করেও বনে আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গান গেয়ে গেয়ে অনুপ্রেরণা যোগাবার জন্য। দেশ স্বাধীন হলে তিনি সেই জোঁকের কামড়ের দাগ দেখিয়ে বলতেন, "আমার তো মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট নেই। এই দাগই আমার জীবনের সেই সার্টিফিকেট আর সাক্ষী।" (হায়দার ২০১৫: ৪৬)

দেশ স্বাধীনের পর সন্তান বাড়ি না ফেরায় শহীদের মায়ের আকুতি তার লেখায় তুলে ধরেছেন আবদুল গফুর হালী—

সোনাইয়ের মা কান্দিললি
বটগাছতলে বই
বেয়াগ্‌গনোর পোঁয়া ফিরি আইলো
আঁর পোঁয়া হই ॥
কুড়ি বছর বয়স অইয়েল
চান্দের মতো মুখ
সোয়ামী হারাই মনে গইজ্জিল
পুতে দিবো সুখ
দারুণ যুদ্ধে সুখের ঘর গান
ভাঙ্গি গিয়ে গই ॥
(রিটন, এস এ টিভি, ডিসেম্বর ২০১৪)

গফুর হালীর লেখা গ্রন্থসমূহ

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয় আবদুল গফুর হালীর গীতিকাব্য *জ্ঞানজ্যোতি*।

এছাড়া তত্ত্ববিধি (১৯৫১), *সুরের বন্ধন* (২০১৩), *স্বরলিপিসহ চাটগাঁইয়া গান শিকড়* (২০১৪), *চাটগাঁইয়া নাটকসমগ্র* (২০১৫) রচনা করেন। তিনি আনুমানিক দুই হাজারের বেশি আঞ্চলিক গানের রচয়িতা এবং লিখে গেছেন ছয়টি নাটক। এগুলো ছাড়াও তিনি "জ্ঞান চৌতিসা", *পঞ্চসতী প্যারাজান*, *হাদিসবাণী* নামক পুঁথিও রচনা করেন।

গফুর হালীর জীবনালোকে ডকুমেন্টরি

আবদুল গফুর হালীর গান ও জীবন নিয়ে চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র সংসদ ও এস এ টেলিভিশন দুটি ডকুমেন্টরি নির্মাণ করেছে। ২০১০ সালে গফুর হালীকে নিয়ে নির্মিত হয় প্রামাণ্যচিত্র *মেঠোপথের গান*। সুবর্ণরেখা পিকচার্স প্রযোজিত ও চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র নিবেদিত ছবিটির সংগীত, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন শৈবাল চৌধুরী। প্রামাণ্যচিত্রটি ৩৯ মিনিটের। একই বছরের ৭ আগস্ট চট্টগ্রাম আঁলিয়্যা ফ্রঁসেস ও ২০১৪ সালে জাতীয় যাদুঘরে এটি প্রদর্শিত হয়।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে আবদুল গফুর হালীকে নিয়ে ছয় মিনিটের একটি ডকুমেন্টরি নির্মাণ করে এস এ টেলিভিশনে। চ্যানেলটির *চট্টগ্রাম দর্পণ* অনুষ্ঠানের *চট্টগ্রামের গান* পর্বে তথ্যচিত্রটি প্রচারিত হয়। তথ্যচিত্রে মাইজভাণ্ডারে হালীর ঐশী প্রেম ও তার সংগীতের মাহাত্ম্য চিত্রিত হয়েছে। (হায়দার ২০১৫: ৫২)

আবদুল গফুর হালীর মৃত্যু

২০১৬ সালে গফুর হালীর অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়ায় তাঁকে মাউন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২০ ডিসেম্বর সুফী মিজান সাহেবকে তাঁর একটি ইচ্ছার কথা জানালে তাঁকে হেলিকাপ্টারে করে মাইজভাণ্ডার দরবার জিয়ারত করতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন ভোররাতে তিনি বিদায় নিলেন, চিরবিদায়। ২১ ডিসেম্বর মাগরিবের পর চট্টগ্রামের জামিতুল ফালাহ মসজিদে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন শাহসুফী সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারীর ছোট ছেলে সৈয়দ মুজিবুল বশর। হাজারো মানুষ জানাযায় অংশ নেয়। দাফন করা হয় নিজের বাড়ির আঙ্গিনায়। যেই কবর তিনি নিজেই খনন করে রেখে গিয়েছিলেন।

গফুর হালীর পুরস্কারপ্রাপ্তি

অসামান্য এই সাধকশিল্পীর বর্ণাঢ্য জীবনে রয়েছে কিছু সম্মাননা, স্বীকৃতি। এই সম্মাননা সত্যিকার অর্থেই কিছুই না যতটা তিনি বাংলা লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিকে দিয়ে গেছেন। তাঁর পুরস্কারসমুহ হলো—

১. রাহে ভাণ্ডার এ্যানোবেল এ্যাওয়ার্ড-২০১২
২. চট্টগ্রাম সমিতি পদক –২০১২ (*Daily Azadi* 25 Dec, 2012)
৩. বাংলাদেশ সংগীত সংগঠন সমন্বয় পরিষদ-২০১৩ (সমকাল ২৪ মার্চ, ২০১৪) (২৮ মার্চ, ২০১৪)
৪. সুখেন্দু স্মৃতি নাট্যপদক-২০১৩ (*সুপ্রভাত বাংলাদেশ* ১ জুলাই, ২০১৩)

৫. জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা–২০১৩/২০১৪ (চট্টগ্রামের টুকরো খবর ২৪ মার্চ, ২০১৪) (*Daily CTG Things* ২৩ মার্চ, ২০১৪)

গফুর হালীকে নিয়ে গবেষণা

জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিশারদ ড. হান্স হার্ডার ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে এসে চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। মাইজভাণ্ডারীর সংগীত নিয়ে গবেষণা করা প্রথম বিদেশী গবেষক তিনি। মাইজভাণ্ডারী গান রচনায় অগ্রগণ্য গফুর হালীকে নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং *আবদুল গফুর হালীর জীবন ও সংগীত* নিয়ে ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত গবেষণা করেন। গবেষণা কর্মটি জার্মান ভাষায় *ডার ফেরুখুটে গফুর স্প্রিখট পোগলা গফুর* শিরোনামে জার্মানির হালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ৭৬টি গান অন্তর্ভূক্ত আছে এটিতে। এগুলোকে *পূর্ববাংলার মরমি গান* বলে উল্লেখ করেন তিনি। ইংরেজী ভাষায় গানগুলো নিবন্ধন করেন তিনি। ২০১৬ সালে আবদুল গফুর হালীর *চাটগাঁইয়া নাটকসমগ্র* গ্রন্থে *টলমল মানবজীবন কচুপাতার পানি যেমন* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ড. হান্স হার্ডার।

আমেরিকার আটলান্টা এমোরি ইউনিভার্সিটির এথনোমিউজিকোলজি বিভাগের ভিজিটিং সহকারী অধ্যাপক ও বেঞ্জামিন ক্রাকাউর আবদুল গফুর হালীর গান নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন,

> আবদুল গফুর হালী একজন আধ্যাত্মিক সাধক, তবে সবার আগে তিনি একজন মানুষ। তার সংসার আছে, জাগতিক ক্রিয়াকর্ম দায়িত্বের সাথেই পালন করেন। তাই গফুর হালীর গানে আধ্যাত্মিকদের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে বাংলার রূপ ও প্রকৃতির কথা। গফুর হালীর গানে নরনারীর প্রেমবিরহ কিংবা আধ্যাত্মিক চেতনা মিশে আছে। (মহসিন ২০১৭: ভূমিকাংশ)

ডার ফেরুখটে গফুর স্প্রিখট গ্রন্থের ৫ নম্বর গানটির একটি লাইন তুলে ধরা যাক:

কাবা গেলা হজ্ব করিতে
মানুষের বানাইয়া ঘর
আসল কাবার রাখছনি রে কেউ খবর!!! (হায়দার ২০১৫: ৪৭)

শেষকথা

আঞ্চলিক গানের সম্রাট হিসেবে খ্যাত আবদুল গফুর হালীর জীবন ও সৃষ্টি পর্যালোচনায় সংগীতের প্রতি তাঁর নিবেদিত প্রাণ, মহান শিল্পী সত্ত্বার পরিচয়ই বহন করে। সংসারী হয়েও যিনি স্রষ্টাকে পাওয়ার আকুল নিবেদন করেছেন তাঁর মাইজভাণ্ডারি গানের মাধ্যমে আবার জীবনের কঠিন বাস্তবতা ও নারী হৃদয়ের ক্রন্দনসহ সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন তাঁর আঞ্চলিক গানে। প্রেম-বিরহ অন্তরজ্বালা ও তারুণ্যের আকাঙ্ক্ষা সহ নদীমাতৃক দেশের চিত্রও এই আঞ্চলিক গানের সম্ভারে বিদ্যমান।

চট্টগ্রামের ভাষাগত সারল্য তাঁকে এই অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ের কথা-মালার সম্রাটে স্থান করে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে ছেলে হারানো মায়ের ক্রন্দন থেকে শুরু করে দাদার একাকিত্বও তাঁর অন্তরাত্মাকে দোলা দিয়েছে এবং বাংলার নারীর দুঃখ-গাঁথা গুলো তাঁর গান রচনায় প্রলুব্ধ করেছে। তিনি একজন দেশপ্রেমিক এবং সচেতন নাগরিক হিসেবেও তাঁর জীবন ও কর্মে প্রমাণ রেখে গেছেন। পরিশেষে বলা যায় মাইজভাণ্ডারের অধ্যাত্মবাদ তাঁকে একজন পরিপুষ্ট মানব হৃদয় দান করেছে এবং শিল্পী জীবনে ধাবিত করেছে। তাই জীবনের পুরো সময়টাকে ব্যয় করেছেন সমাজ ও মানুষের হৃদয়কে গানের মাধ্যমে সংস্কার করার মাধ্যমে। এই মহান আত্মার বিদেহী শরীরকে তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই চিহ্নিত করে গেছেন এবং কবর খুঁড়ে রেখে গেছেন। সেই কবরেই তাঁকে দাফন করা হয়। যা তাঁর বাড়ির আঙিনাতেই অবস্থিত। এ থেকেই মানুষটির ধর্ম বিশ্বাস, দূরদর্শিতা ও প্রবলভাবে বাস্তবতা ধারণ করবার নমুনা প্রদর্শিত হয়, যা তাঁকে আরও বেশি অমর করে তুলেছে। শিল্পের যে শাখায় তিনি হাত দিয়েছেন যেন সোনা ফলিয়েছেন। এছাড়াও তিনি তাঁর নাটকে কিছু বিলুপ্ত প্রায় গানেরও সংযোজন ঘটিয়েছেন। প্রচারের অভাবে তাঁর নাটকগুলোর পরিচিতি কম হলেও অদূর ভবিষ্যতে এই নাটক নিয়ে উত্তোরোত্তর গবেষণার আশা ব্যক্ত করছি, যা একদিন বিশ্ব পরিসরে সমাদৃত হবে।

তথ্যসূত্র

আরেফিন, শামসুল (২০২০)। *চট্টগ্রামের লোকগান: বিবিধ প্রবন্ধ*, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম।

চৌধুরী, শৈবাল (২০১০) (সংগীত, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা)। *সুবর্ণরেখা পিকচার্য প্রযোজিত ও চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র নিবেদিত: মেঠোপথের গান*, চ্যানেল টুয়েন্টিফোর, ঢাকা।

চৌধুরী, আলী হোসেন (সম্পা.) (২০১৪)। *আবদুল গফুর হালী: শিকড় স্বরলিপিসহ চাটগাইয়া গান*, আবদুল গফুর হালী একাডেমী, চট্টগ্রাম।

মহসিন, মোহাম্মদ (সম্পা.) (২০১৭)। *আবদুল গফুর হালী: 'দিওয়ানে মাইজভাণ্ডারী'*, সুফী মিজান ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম।

রিটন, শাহ্‌নেওয়াজ (২০১৪) (প্রযোজনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা)। অনু. চট্টগ্রাম দর্পণ ডকু. চট্টগ্রামের গান, এস এ টিভি, চট্টগ্রাম।

হায়দার, নাসির উদ্দিন (সম্পা.) (২০১৩)। *সুরের বন্ধন স্বরলিপিসহ আবদুল গফুর হালী'র গীতিকাব্য*, আবদুল গফুর হালী একাডেমী, চট্টগ্রাম।

হায়দার, নাসির উদ্দিন (সম্পা.) (২০১৫)। *আবদুল গফুর হালী: চাটগাঁইয়া নাটক সমগ্র*, সুফী মিজান ফাউন্ডেশন, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।